'কাঁদনাগীত' প্রসঙ্গে

শান্তনু দলাই

বাংলায় প্রচলিত লোকগানের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী লোকগান 'কাঁদনাগীত'। যন্ত্রানুসঙ্গ ব্যতীত একক বা দ্বিত্ব নারীকণ্ঠে গীত এই গান বহুকাল আগে থেকে লোকসমাজে প্রচলিত আছে এবং কালপরম্পরায় বহমান আছে। 'কাঁদনাগীত' আসলে কান্নার মাধ্যমে করুণ সুরে অতীতে ফেলে আসা স্মৃতিচিত্রের বিবৃতি। সুখস্মৃতির বিবরণ থাকলেও মূলত দুঃখের বর্ণনা এই গানের প্রধান উদ্দেশ্য। এই গানে স্বতঃস্ফূর্ত পাঠ (Text) সৃষ্টি হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থায়ীপাঠ নারীমুখে মুখস্থ ও মনে আত্মস্থ হয়ে আছে। এমনকি কাঁদনাগীতের মুদ্রিত পুস্তিকাও পাওয়া গেছে। আলোচ্য নিবন্ধে এইরূপ অভিনব লোকগানের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব কাঁদনাগীতের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে।

কন্যা বিদায়ের সময় ওড়িশা এবং ওড়িশা প্রান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নারীদের দ্বারা করুণ সুরের মাধ্যমে গীত হয়ে আসছে 'কাঁদনাগীত'। শুধুমাত্র ওড়িশা কিংবা তৎসংলগ্ন মেদিনীপুর নয়, ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী বাংলায়ও এই কাঁদনাগীতের প্রচলন আছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার দ্বারা আমরা সুবর্ণরেখার উভয় তটভূমি (বাংলা ও ওড়িশা) থেকে কাঁদনাগীতের সন্ধান ও সংগ্রহ করলেও পার্শ্ববর্তী ওড়িশা রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে ও ঝাড়খণ্ডে আন্তর্প্রবিষ্ট হয়েছে। সংস্কৃতির এই সহিষ্ণুতার আদান-প্রদান এবং সীমান্ত-সংস্কৃতির চর্চাকে প্রান্তবঙ্গীয় আন্তঃপ্রবেশী লোকসংস্কৃতিচর্চা বলা হয়ে থাকে। বাংলা ও ওড়িশার আন্তর্প্রবিষ্ট লোকসংস্কৃতির একটি পরম্পরিত লোকগীতি হলো 'কাঁদনাগীত'।

ওড়িশা থেকে বাংলায় আন্তর্প্রবেশের সূত্রে ভাষাগতভাবে বাংলা ও ওড়িয়ার যুগলবন্দী ঘটেছে। এর ফলে বাংলার উপভাষিক বৃত্তে ওড়িয়া ভাষার কাঁদনাগীত আন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে বাংলা উপভাষিক কাঠামোয় নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। যার ফলে দুই ভাষার মিশ্র বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি হয়েছে একটি মিশ্রভাষিক পাঠ (Text)। সুতরাং ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় মিশ্রিত হলো 'উত্তরা ওড়িয়া' উপভাষা। তবে এই ভাষায় ওড়িয়া শব্দ অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকলেও উক্ত এলাকার লোকভাষার বিমিশ্রণ লক্ষণীয়। বাংলা ভাষা-কাঠামোয় ওড়িয়া ভাষার আন্তর্প্রবেশের এইরূপ ঘটনাকে কেউ কেউ 'ভাষিক-আন্তঃপ্রবেশ' (Language Interpenetration) রূপে চিহ্নিত করেছেন।

বর্তমান প্রবন্ধে ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ কাঁদনাগীতকে যেমন দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরা হবে, তেমনি অপরদিকে কাঁদনাগীতের তিনটি পুস্তিকার মুদ্রিতরূপের নিদর্শনকে তুলে ধরা হবে। প্রথমে ধারণা স্পষ্ট করে নিতে হবে যে, কাঁদনাগীত আসলে কান্না, নাকি গান। প্রথমত যদি গান

হয় তাহলে তার পাঠ বা Text তাল-সুর-লয়ের অনুসারী হবে এবং তা অনেকটা পরিকল্পিত। অন্যের মর্মস্থলে অনুপ্রবেশের আকাঙ্ক্ষা রাখবে। দ্বিতীয়ত, যদি এটি কান্না হয়, সুরকে আশ্রয় করে গানের ভঙ্গিতে কেন—এ প্রশ্ন আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। নিঃশব্দে অশ্রুমোচন অনেকটা অব্যক্ত। তাই বেদনা উদ্রেককারী ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে হয় ফেলে আসা স্মৃতিকে এবং ভাবী অনিশ্চয়তাকে। কাঁদনাগীত আসলে গাইতে গাইতে চোখ ভিজে আসে না, কাঁদতে কাঁদতে গলা চিরে গান চলে আসে। কান্না রূপান্তরিত হয় গানে, অশ্রু বেয়ে ফুটে ওঠে সুর। ফলে 'কাঁদনাগীত' শুধুমাত্র যে গান তা নয়, আসলে কান্না। স্বতঃস্ফূর্ত সুর, স্বতোৎসারিত ভাষা, তাৎক্ষণিক পাঠ (Text)-এ এটি লোকগানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম নেয়। সুতরাং লোকসাহিত্যের চর্চায় আমরা এই অভিনব সংস্কৃতিকে রূপগতভাবে গান ধরে নিয়ে কাঁদনাগীতের প্রসঙ্গে গভীরে প্রবেশ করতে পারি।

লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে চারটি সীমা (boundary)-কে মাথায় রাখতে হয়, যথা—ক. ধারণাগত সীমা (Conceptual Boundary), খ. স্থানিক সীমা (Spatial Boundary), গ. সম্প্রদায়গত সীমা (Communal Boundary) এবং ঘ. কালিকসীমা (Time Boundary)। ধারণাগত সীমায় যদি আমরা কাঁদনাগীতকে ফেলে বিচার করি তাহলে কন্যা বিদায় কালে নারীদের অংশগ্রহণ, সহানুমর্মিতা প্রকাশ এবং অশ্রুমোচন আসলে একটি সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্য বা মানবিক মূল্যবোধের প্রকাশ বলা চলে। কাঁদনাগীতির স্থানিক সীমা নির্ণয় করতে গেলে অবশ্যই গানটি একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Culture Area)-র মধ্যে প্রতিফলিত। সেদিক থেকে কাঁদনাগীত আসলে বাংলা ও ওড়িশার এমনকি ঝাড়খণ্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতেও প্রচলিত। আন্তর্প্রবেশী এই ওড়িয়া লোকগানের প্রবাহ সীমান্তবর্তী বাংলার মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, দাঁতন, মোহনপুর, এগরা, রামনগর প্রভৃতি এলাকায় যেমন প্রচলিত আছে ঠিক তেমনি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর জেলার গ্রামাঞ্চলেও প্রচলিত আছে। অঞ্চলগুলি প্রশাসনিকভাবে দুটি ভিন্ন প্রদেশের হলেও এদের সাংস্কৃতিক রূপের মিল অনেক বেশি। সম্প্রদায়গতভাবে এই এলাকাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করলে ধর্ম-ভাষা-জাতিগত সাদৃশ্য এবং রুজি-রোজগার বা পেশাগত মিল দেখতে পাই। সবশেষে সময়সীমার কথা বলতে গেলে কাঁদনাগীত বিশেষ কোনও পরবকেন্দ্রিক লোকগান নয়। বছরের যে-কোনো সময় এই গান গীত হয়। কারণ বিবাহ ও মৃত্যুর কাল কখন এসে পড়ে—আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। জীবনের এই দ্বিবিধ পরিণতিতে মানুষ মানুষের পাশে থেকে সমব্যাথী হন। বিষয়বস্তুগত বিচারে 'কাঁদনাগীত' প্রধানত দুই ধরনের হয়, যথা—১. কন্যা বিদায়ের গান ও ২. মরণযাত্রার গান। সুতরাং কালগতভাবে দুটি সংকটকালই কাঁদনাগীতের উপযুক্ত সময়। আলোচ্য প্রবন্ধে সীমিত পরিসরের কারণে শুধুমাত্র কন্যা বিদায়ের গানকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি।

কাঁদনাগীত মূলত লৌকিক ধারার গান হলেও এর মুদ্রিত রূপের প্রকাশ আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় তথা মেদিনীপুরের ওড়িশা সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে প্রচলিত আছে কাঁথির নীহার প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত বেশ কয়েকটি কাঁদনাগীত বিষয়নির্ভর ছোটো ছোটো পুস্তিকা। লোকসংগীতের পরিবর্তনশীল পাঠ বা Text -কে স্মৃতি থেকে মুদ্রিত হরফে নিয়ে আসার মতো সংরক্ষণশীল চেতনা অ্যাকাডেমিক মানুষের

থাকে এটা আমরা জানি, কিন্তু অল্প শিক্ষিত সাধারণ লোককবিগণ যে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা ছাড়া করে গেছেন তা সত্যিই অভিনব। এমনকি বিবাহানুষ্ঠানে ওড়িশা সীমান্তবর্তী বাংলায় এবং বাংলা সীমান্তবর্তী ওড়িশায় স্বল্প কবিত্বশক্তি সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি নিজে নানা নীতিকথামুলক পদ রচনা করে নববধূকে উপহার দিতেন। আসলে স্মৃতি থেকে হাতড়ে অল্প শিক্ষিত কোনও কোনও লোককবি 'কাঁদনাগীত'কে লিখিত রূপে প্রকাশ করে সর্বজনীন লোকসাহিত্যকে ব্যক্তি-স্বাক্ষরে ফুটিয়ে তুলতেন। কাঁদনাগীতগুলি যাতে কালের অতল তলে তলিয়ে না যায় তার জন্য এই লোককবিগণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এগিয়ে এসে নিজের প্রতিভার পরিচয় ও এই গানের স্থায়িত্বদানে প্রয়াসী হয়েছেন। ব্যক্তিপ্রতিভার স্পর্শে এই গানগুলির Text বা মূল পাঠের পরিবর্তন বা আংশিক পরিবর্তন হতে পারে হয়তো, কিন্তু কাঁদনাগীতির বিশেষ ছাঁচে এই গানগুলি নির্মিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে আলোচনার জন্য চন্দ্রমোহন ধলের লেখা 'গেহ্লা ঝিঅ', অজ্ঞাত এক লোককবির লেখা 'সুনা ঝিঅ' এবং বনমালীর লেখা 'জেমা রোদন'—এই তিনটি কাঁদনাগীতকে নির্বাচন করা হয়েছে এবং এর সঙ্গে পর্যালোচিত হবে ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর নির্বাচিত কয়েকটি কাঁদনাগীতের তুল্যমূল্য পাঠ প্রসঙ্গ।

১. গেহ্লা ঝিঅ : চন্দ্রমোহন ধল

'গেহ্লা ঝিঅ' গানের কাহিনি অংশের মূল চরিত্র 'গেলী' নাম্নী এক আদরিণী কন্যা। বিবাহের পর প্রথম সে শ্বশুরালয়ে যাবে। তাকে বিদায়ের জন্য সকল আয়োজন সম্পূর্ণ। এমতাবস্থায় কন্যা ক্রমান্বয়ে বাবা, মা, দাদা, বৌদি, কাকা, কাকিমা, ঠাকুরমা, সেজ বোন—এদের কাছে গিয়ে নিজের ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতিগুলি রোমন্থন করে কাঁদতে থাকে উচ্চকিত কণ্ঠে। প্রথমে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে—

নিজ ন খাইত খুআউ থিল। মা'গো
ষোল বর্ষ যাএ পাখে রখিল॥ ঐ
কিবা দোষ কলি তুম্ভ পয়র। ঐ
পঠাই দেউছ দূর দেশর॥
এহা যেবে মনে থিলা তুম্ভর। মা'গো
বেক মাড়ি থান্ত জন্ম কালর। ঐ

মেয়েটি বলতে চেয়েছে যে, নিজে না খেয়ে মা তাকে খাইয়েছে। অথচ আজ তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এই যদি মনে ছিল তাহলে গলায় পা তুলে জন্মের সময় কেন মেরে ফেলল না। বাবার কাছে গিয়ে মেয়েটি বলে—

পাকিলা কদলী ফেণিকি ফেণি। বাপা'গো
বাপ ঘর ঝিঅ মউড় মণি॥ ঐ
আলু পতর কি পান হোইব। ঐ
পর দেশরে কি মন রহিব॥ ঐ

অর্থাৎ কলা পাকলে বেশি দিন রাখা যায় না। যুবতী বিবাহযোগ্যা কন্যাকেও বাড়িতে রাখা যায় না। আলুর পাতা কখনও পান হতে পারে না তেমনি পরদেশে কখনও জন্মভূমির মতো শান্তি পাওয়া যায় না। স্মৃতি রোমন্থন বা দুঃখ বর্ণনার মধ্যে ফুটে উঠেছে অভিনব অলংকার। নববিবাহিত মেয়েকে বাপের বাড়ির পুকুরে ফোটা লাল শালুক ফুলের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। উপমান (শালুক ফুল) কে দেখে উপমেয় (গেহ্লি) কে যেন মনে পড়বে

আর তৎক্ষনাৎ বাবা যেন গেছ্নিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনতে যান।

২. সুনা ঝিঅ : কবি পরিচিতি অনুপস্থিত

'সুনা ঝিঅ' নামক কাঁদনাগীতে সেইভাবে কোনও মূল কাহিনি নেই, যা আছে অতীতের স্মরণীয় কিছু ঘটনার আবেগঘন স্নেহবন্ধনের বিবরণ। শোভারানি নামক নববিবাহিতা মেয়েটি তার বাবা-মা, কাকা-কাকিমা, ঠাকুরমা, বোন এবং সঙ্গী-সাঙাতদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া এবং মনে রাখার মতো ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এই স্মৃতিগুলি নারী জীবনের অতীত শৈশবকে নাড়া দিয়ে যায়। এই গানে বাবা-মা তার মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে চলার মতো নীতিশিক্ষা প্রদান করেছেন। শ্বশুরবাড়ির নতুন পরিবেশে সবকিছু মানিয়ে চলতে হবে এবং শ্বশুর বাড়ির রীতি-নীতি তাকে আত্মস্থ করতে হবে, সংসারের মঙ্গালের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। গানের একটি জায়গায় মেয়েকে খাদ্যের বাদ-বিচার করতে নিষেধ করেছেন তাঁর মা—

মো 'সুনাঝিঅ' বলি বলিবে জন,
মুটী পখালি অবাবাসী তোরানি,
বাছিবু নাহি কেবে মো মো রানি,
যাহা পাইবু
পাদোদক পাইলে তাহা খাইবু।

নবযুগের ধর্ম বা আধুনিক কালের রীতি-নীতি শেখাতে মা কিন্তু ভুলে যাননি। স্বামী সহবাসের নিরাপদ সময়কাল গণনা করে মিলিত হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন মা। কারণ তার মেয়ে যাতে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ করে সমস্যায় না পড়ে সে বিষয়ে মা সচেতন করেছেন মেয়েকে। প্রতিটি কাজে স্বামীর সাথে যুক্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন মা—

কান্ত আগমকাল রখিবু গণিরে।
করি পালন নবযুগ ধরম,
যুক্তি সিদ্ধান্তে কর প্রত্যেক কর্ম।

সুনাঝিঅ গানটিতে উপমা অলংকারের ব্যবহার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে। দৃষ্টান্ত রূপে একটি পূর্ণোপমা অলংকারের নমুনা দেওয়া যায়—

বাড়ি কদলী পরা কাঁন্দিরে পচে, শোভারে
বাপ ঘরর ঝিঅ সভারে নাচে। ঐ

অর্থাৎ মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বাগানের কলা যেমন পাড়তে দেরি করলে কাঁদিতে পেকে পচে যায় ঠিক যুবতি মেয়েকে বাপের বাড়িতে ঠাঁই দিলে 'সভায় নাচে' অর্থাৎ চরিত্রভ্রষ্টা হয়।

৩. জেমা রোদন : বনমালী

'জেমা রোদন' গানটিতে পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিয়ে পতিগৃহে রওনা হওয়ার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। জেমা প্রথমে মায়ের কাছ থেকে জানতে চেয়েছে—

মোতে জনম দেই দেউঅছ পঠাই
পর ঘরে দিন কাল কাটিবা পাঁই।
মাতা কি কর্ম কল মোতে বড়াই থিল
এতে দিনে তুম্ভ কোল ছড়াই দেল।

এইভাবে একে একে বাবা, দাদা, ভাই, বোন, কাকা, কাকিমা ও ঠাকুমা প্রত্যেকের কাছে অশ্রুবিগলিত নেত্রে জেমা তার ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতিগুলি বলতে থাকে। অপরদিকে তার আপনজনেরা তাকে প্রবোধ দিতে থাকে। তার চোখের জল মুছে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় জানাতে থাকে। খুড়িমা তাকে অনতিবিলম্বে 'ভাদ্র মাসের গম্মা'য় ফিরিয়ে আনবে বলে কথা দেয়। ওড়িশা এবং ওড়িশার সন্নিহিত বাংলায় ভাদ্রমাসের গম্মা পূর্ণিমায় মেয়ে-জামাইকে বাড়িতে এনে আদর-আপ্যায়ন করা হয়। অনেকটা বাংলার জামাইষষ্ঠীর মতো। এইরকম একটি সাংস্কৃতিক চিত্র ফুটে উঠেছে এই গান—

সত্য কহুছি জেমা ভাদ্র মাসর গম্মা
তহিঁকি আসিব আউ নুহ বিমনা।

এ পর্যন্ত আমরা কাঁদনাগীতের মুদ্রিত রূপের পরিচয় দিলাম। প্রকৃতপক্ষে কাঁদনাগীত লোকগীতির শাখাভুক্ত মৌখিক ধারার সাহিত্য। পুরুষ কবি লোকরঞ্জনের জন্য স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে তাকে লিপিরূপ দিলেন বটে কিন্তু কাঁদনাগীত পুরোপুরি মহিলাদের দ্বারা রচিত ও পরিবেশিত। মা-বাবা, ভাই-বোন, মাসি-পিসি এমনকি সখী-সাঙ্গাতদের উদ্দেশ্যে কাঁদনাগীত আছে। শুধু মেদিনীপুরে ওড়িশা নয়—"ওড়িশার লোকায়ত সমাজে এখনও কাঁদনাগীতের প্রচলন আছে। শ্রী চক্রধর মহাপাত্র তাঁর 'উৎকল গাঁউলি গীত' গ্রন্থে ওড়িশার কাঁদনাগীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।"[১]

কাঁদনাগীত মূলত ওড়িশার গ্রামীণ গীত। পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে যে কাঁদনাগীত পাওয়া যায় তার মধ্যে ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক ভাষার লক্ষণ বা উপভাষিক লক্ষণ মিশ্রিত আছে—"তার ভাষা পুরোপুরি ওড়িয়া নয়—তা বাংলার আঞ্চলিক লক্ষণ মিশ্রিত ওড়িয়া। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য, যারা প্রাত্যহিক জীবনে আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলে, তাঁরাই কাঁদনাগীত গায় মিশ্র ভাষায় এবং মিশ্র ভাষাতে গান রচনা করে।"[২] সুবর্ণরেখার পূর্ব তটবর্তী বাংলায় যে আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত আছে যা সুবর্ণরৈখিক ভাষা রূপে পরিচিত সেই ভাষায় বেশ কয়েকটি প্রচলিত কাঁদনাগীত সংগ্রহ করে পুস্তিকা আকারে সম্পাদনা করেছেন বেবী সাউ। গানগুলি সংকলিত হয়েছে তাঁর 'কাঁদনাগীত : সংগ্রহ ও ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের কাঁদনাগীতিগুলি সুবর্ণরেখার তীরবর্তী গ্রামের ভাষায় গীত হয়। এই গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—

উঠিলা সুয়ারি বসিলা নাই কাকীগো।
ঘুরি চাহিবাকু দিশিলা নাই কাকীগো।
গড়িয়া ভিতরে নড়িয়া গাছ কাকীগো।
নড়িয়া ধরিচে গুটি পঞ্চাশ কাকীগো।
এঠে খাইথাঙ গটা নাড়িয়া কাকীগো।
সেঠে কী খাইমু বাঁটা নাড়িয়া কাকীগো।

শ্বশুরবাড়ির শ্বাসরোধকারী পরিবেশে মেয়েটিকে কাটাতে হয়। সেই কষ্ট সহ্য করা আর যায় না— কাতরভাবে মেয়েটি বলেছে—"নদীর ধারে ধারে পাকা পনস মাগো/মোর শাশুঘরে কালা বংশ মাগো।" পূর্বে আলোচিত 'গেহ্লি ঝিঅ' শীর্ষক ওড়িয়া ভাষায় কাঁদনাগীতটিতে অনুরূপভাবে ধরা পড়ে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কথা। সেখানে দেখতে পাই জা-ননদের

মানসিক অত্যাচারের বর্ণনা, যেমন—

শারি যেসনে পিঞ্জরা ভিতরে। মাগো
বন্দী হোই থাএ কর্মদোষরে॥ ঐ
সেহি পরি মোতে বন্দী করিণ। ঐ
ননদ যাউলি থিবে জগিন॥ ঐ

অর্থাৎ শারি যেমন নিজের কর্মদোষে পিঞ্জরে বন্দি থাকে মেয়েটিকেও সেইভাবে জা-ননদের নজরদারিতে বন্দি থাকতে হয়। তার নিজের স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেবশ্রী পালিত ২০১৪ সালে 'প্রান্তবঙ্গের আন্তর্প্রবেশী লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। এই গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কাঁদনাগীত প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন।

গানগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এগুলি (ক) অশ্রুসজল (খ) একক বা দ্বিত্ব নারীকণ্ঠে গীত (গ) রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ (ঘ) নীতি-উপদেশ মূলক ও (ঙ) যন্ত্রানুষঙ্গ বর্জিত লোকগান। এই গানগুলির (চ) নির্দিষ্ট পাঠ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতুন নতুন পাঠের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রথম দিকে কাঁদনাগীতগুলি নারী ও পুরুষ (বাবা, কাকা, দাদা) উভয়ে গাইলেও পরে এই গানগুলি শুধুমাত্র নারীরা পরিবেশন করে আসছেন। এই গানগুলি ধর্মনিরপেক্ষ হলেও (ছ) প্রথাকেন্দ্রিক—কারণ কন্যা বিদায়ের সময় কাঁদনাগীতি না উচ্চারিত হলে পিতৃগৃহে অমঙ্গল হয়। ফলে কন্যা বিদায়ের কালে মহিলারা কাঁদনাগীতে গলা মেলানোটাকে মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করেন। সচরাচর মধ্যবয়স্কা তথা প্রৌঢ়ারা এই গানে গলা মেলান। গানগুলির বর্ণিত বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হলেও সেগুলি (জ) আদল একই ছাঁচে ফেলা এবং উপস্থাপন ভঙ্গি অভিন্ন। (ঝ) খণ্ড খণ্ড স্মৃতিচিত্র গানগুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গীতিকা বা বড় গানের মতো দীর্ঘ আখ্যানের ব্যবহার এখানে নেই।

এই সাহিত্যে নারীজীবনের অনিবার্য নিয়তির কথা বার বার ব্যক্ত হয়েছে। গুরুজনেরা কন্যার প্রতি নীতি-উপদেশ ও চরিত্র গঠনের শিক্ষা প্রদান করেছেন। সমাজচিত্র, পরিবার জীবন, কন্যাপণের প্রথা, বিবাহের রীতিনীতি বা প্রথা-পদ্ধতির চিত্র ফুটে ওঠে অনেক সময় এই গানগুলিতে। গঠনগত দিক থেকে এই 'কাঁদনাগীত'-এ ধুয়ো বা ধ্রুবপদ বিশিষ্ট পংক্তি লক্ষ করা গেছে। এখন এটি একক বা দ্বিত্বগীত হলেও আসলে এই গান এককালে একক গীতি ছিল না, একাধিক নারীর সমবেত গীত ছিল। মূলত নারীরা এই গানের অংশগ্রহণকারিণী। পরবর্তীকালে সমাজের আত্মিক বন্ধন শিথিল হওয়ায় ক্রমশ অংশগ্রহণকারিণীর সংখ্যা কমে একক বা দ্বিত্ব গীতে পরিণত হয়েছে। এই গানের কেন্দ্রে থাকে কন্যা। কন্যাকে ঘিরে মা, মাসি-পিসি, বোন, বৌদি, বান্ধবী ও অন্যান্য প্রতিবেশিনী সকলে এই গানে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং ধ্রুবপদের ব্যবহার বা ধুঁয়ো ধরার রীতিটি এই বিশেষ লোকগীতিতে প্রযোজ্য। এই গানের লয় প্রলম্বিত। করুণ সুরকে প্রবাহিত করে তোলবার ক্ষেত্রে গানের ধুয়ো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। অনেক সময় একই শব্দবন্ধ বা পদাংশ চরণ থেকে অন্য চরণে উচ্চারিত হয়ে Parallalism বা সমান্তরলতা সৃষ্টি করে, যেমন—

আলু পতর কি পান সমান গো কাকা

মুহি তহর ঝিয় সমান গো ঐ
আলু পতর কি পান হইব গো ঐ
মুইকি তুমর ঝিয় হইমু গো কাকা

(বেবী সাউ প্রণীত 'কাঁদনাগীত : সংগ্রহ ও ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

এই সকল গীতির Text বা মূল পাঠটি অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের মাধ্যমে নতুন Text-এর জন্ম হয়—

> মা, বাবা, মামা ইত্যাদি স্বজন আত্মীয়ের কাছে কি বলে কাঁদা হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ (Text) আছে এবং তার পাঠান্তরও পাওয়া যায়। এইসব গানগুলিতে নারীজীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা করুণ মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।[৩]

কাঁদনাগীতের পরিবেশক যেহেতু একমাত্র নারী। তাই নারীর জীবনবৃত্তের স্মৃতিমেদুর খণ্ডচিত্র ছোটো ছোটো কোলাজের মতো ফুটে ওঠে এই গানে। গবেষক দেবশ্রী পালিত তাঁর 'প্রান্তবঙ্গের আন্তর্প্রবেশী লোক সংস্কৃতি' শীর্ষক গবেষণা পত্রের একটি জায়গায় লিখেছেন—

> পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের কাঁদনাগীতিগুলির লিঙ্গগত প্রেক্ষিত (Gender Perspective) আলোচনা করলে দেখা যায়, এই টুকরো গীতিগুলি বাংলার এক বিশেষ অঞ্চলের সূত্র ধরে আপামর নারী সমাজের হৃদয় বেদনার অংশীদার সুতরাং, এইদিক থেকে দেখলে কাঁদনাগীতের যেমন আছে সার্বজনীন ও সর্বকালিক রূপ। তেমনি এই গীতগুলি আঞ্চলিক হয়েও, ভাববস্তুর দিক দিয়ে সার্বভৌমত্বের অধিকারী।[৪]

'সুনা ঝিঅ' নামক কাঁদনাগীতে বাবাকে জড়িয়ে মেয়েটি কাঁদতে থাকে এই বলে—

গড়িয়া
পুঅ জনম খ্যাতি দেশ দেশকু, বাপা গো
ঝিঅ জনম সিনা ঘর কণকু বাপা গো
এহা উচিৎ (পৃ. ১২)

অর্থাৎ পুত্রের খ্যাতি ও গুরুত্ব দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু কন্যা সারাটি জীবন ঘরের কোণে বন্ধ থাকে—কিন্তু এই গানটিতে মেয়েটি তার বৈবাহিক জীবনের বন্দি দশা কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না বলে তার বাবাকে জানিয়ে দেয়। মেয়েটি তার মাথার উপর চায় উন্মুক্ত আকাশ। তৎকালীন সমাজে বাবাকে পণ দিয়ে পাত্রকে কন্যার পাণিগ্রহণ করতে হতো। বরপণের মতো কন্যাপণ প্রদানের প্রথা শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই ছিল। হতদরিদ্র পরিবারগুলিতে বিয়েকে কেন্দ্র করে টাকা-পয়সা বা সোনা-দানার বিনিময় হতো। এই পণের লোভে অনেক দুধের সন্তানকে 'বেচে দিত' পিতা। আমাদের সংগৃহীত 'গেহ্লা ঝিঅ' গানটিতে গেহ্লি নামের মেয়েটি এইরকম নিষ্ঠুর পণপ্রথার নিন্দা করেছে এইভাবে—

ডেঙ্গা তালগাছ বাটকু ছাই। মাগো—
যেতে কুট কলে মঝিয়া ভাই॥ ঐ
বাপা শোই থিলে উত্তর ঘর। ঐ
টঙ্কা পঁহুছিলা দাণ্ড দুয়ার॥ ঐ
যঁহু যঁহু টঙ্কা ধূব দিশিলা। ঐ
তঁহু তঁহু বাবার লোভ বসিলা। ঐ (পৃ. ১)

লম্বা তালগাছ যেমন পথের পথিককে ছায়া দেয়না ঠিক তেমন মাথার উপর বাবা-দাদার মতো বড়োরা জীবনে শান্তি দিতে পারেনা। মেজদা কূট-চক্রান্ত করে বরের কাছ থেকে পণ আদায় করে আনেন। উত্তর দিকের ঘরে বাবা শুয়েছিলেন। মেজদা তার কাছে টাকা পৌঁছে দিলে বাড়ির উঁচু দাওয়ায় বসে বাবা টাকা গুনে নেন এবং ধুতির কোঁচড়ে বেঁধে নেন। বাবার চোখে টাকাগুলি যতই চকচক করে ততই তার টাকার প্রতি লোভ বাড়ে। নারীর প্রতি পরিবারের পুরুষ তথা বাপ-দাদার এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের কাঁদতে কাঁদতে প্রতিবাদ করেছে হতভাগিনী মেয়েটি। এছাড়া দেবশ্রী পালিতের গবেষণাপত্রে উল্লিখিত হয়েছে একটি কাঁদনাগীত। তাতেও প্রকাশ পেয়েছে কন্যাপণের একটি নিষ্ঠুর দৃশ্য—

আম্ব কষি কষি বউল কষি বহুরে
দান দেই থিলু সভারে বসি বহুরে
দান দেই কিরি কি পুণ্য কলু বহুরে
গাই বাছুরি কি বিকাই দেলু বহুরে
গাই বিকি দিলু গুহালে থাই বহুরে
মত্তে বিকি দিলু সভারে থাই বহুরে[৫]

গানটির মধ্যে ফুটে উঠেছে যেন মেয়েটি মানুষ নয়, সে গৃহপালিত পশু। বিয়ের নামে বসে কেনা-বেচার হাট। বিয়ের সভায় সবার সমক্ষে কন্যাপণ দিয়ে আদরে মেয়েকে বরের হাতে তুলে দিল বাবা। গৃহস্থ যেমন গোয়াল থেকে দর-দাম করে টাকা নিয়ে গৃহপালিত গোরুকে ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেয় ঠিক তেমনি। এই কাজে কি কোন পুণ্যার্জন হয়—এইরূপ প্রশ্ন রেখেছে মেয়েটি। কাঁদনাগীতির অধিকাংশ গানগুলির এক সাধারণ মর্মকথা খুঁজে পাওয়া যায় তা হলো—'বিবাহ' নামক প্রথাটি আসলে পুরুষের স্বার্থরক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। যন্ত্রণাময় স্বামীর ঘরতো পরেরই ঘর। সুতরাং পরহস্তে অর্পণ করে পরের ঘরে পাঠানো মানে যমের ঘরে পাঠানো। একটি গানে ফুটে উঠেছে সেই কথা—

পর ঘর নাঞি যমর ঘরবহুরে
বুঝি শুনি করি বিদায় কর বহুরে

গানগুলিতে 'বিবাহ' কন্যার কাছে কোনো অর্থই বহন করেনা বরং তার স্বাধীনতার 'বোধ'-কে নষ্ট করে নিজের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব কায়েম করতে চায়—অশিক্ষিত লোকায়ত নারী।'[৬] সুতরাং কান্নার ভাষায় প্রতিবাদতো আছেই—তবে মৃদুভাবে। কারণ স্বামীর ঘর আসলে যমের ঘর—এই ধারণা অধিকাংশ কাঁদনাগীতির লিখিত ও অলিখিত Text-এ খুঁজে পাওয়া গেছে। সুতরাং নারীর স্বাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশের আকাঙ্খা যেমন কাঁদনাগীতির মর্মকথা ঠিক তেমনি নিষ্ঠুর কন্যাপণের তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে কান্নার ভাষায়। এই কাঁদনাগীত ঠিক কোন সময়ে এবং কীভাবে গাওয়া হতো তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। লোকসংগীতের অন্যান্য ধারার মতোই কোনও এক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত থেকেই এই গানের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। এর উপস্থাপন যেহেতু Sudden situation বা তাৎক্ষণিকভাবে, ফলে একে লিপিরূপে ধরে রাখা অনেক কঠিন। "যার জন্ম তাৎক্ষণিক, আয়ুও সামান্যই। এই শোকপ্রকাশের ক্ষণটুকুই তার বিস্তার ও বৈভব।"[৭] তবে সমাজ জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলি উঠে এসেছে এই গানগুলিতে। গৌরীদান ও বাল্যবিবাহের সময় থেকে এই

কাঁদনাগীতির প্রচলন হয়ে আসছে বলে আমার ধারণা। পরবর্তীকালে বেশি বয়সী মেয়েকে বিয়ে দেওয়া কিংবা ভালোবেসে বিয়ে করার কারণে লোকসমাজ থেকে কাঁদনাগীতের প্রচলন ধীরে ধীরে উঠে যায়। সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা মানুষের সঙ্গে দুধের সন্তান ঘর করবে আর তার উপর শাশুড়ির শাসন ও গঞ্জনা সহ্য করে পরের ঘরে কীভাবে মানিয়ে চলবে—এই সংশয় ঘনীভূত হয়ে অশ্রু ও সুরে মাধ্যমে কাঁদনাগীত হয়ে ফুটে ওঠে। ফলে অন্যান্য লোকগীতির মতো এই লোকগীতে Stituation বা পরিস্থিতি নির্ভর আবেগমথিত কাব্যভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

তবে আজকের দিনে—"কাঁদনাগীতগুলো বর্তমান বিলুপ্ত প্রায়। কারণ সে পরিবেশও আর নেই।"[৯] এ সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটি প্রতিবেদন—

> এক সময় দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার ঘরে ঘরে কাঁদনাগান গাওয়া হতো। কিন্তু সময় বদলেছে। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বদল হয়েছে। ধীরে ধীরে কমেছে কাঁদনা গান গাওয়ার প্রবণতা। এখন তো লোকসাহিত্যের এই ধারাটি শুকিয়ে যেতে বসেছে।[৯]

তবে কোনো সংস্কৃতি সম্পূর্ণ মৃত—এ কথা সমর্থনযোগ্য নয়। কেউ কেউ 'মৃতসংস্কৃতি'র ধারণা পোষণ করলেও আলফ্রেড লিউইস ক্রোবার প্রমুখ নৃবিজ্ঞানীগণ সংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় দশা কিংবা পরিবর্তমানতার বৈশিষ্ট্যটিকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের মতে, "সংস্কৃতি 'সুপার-অর্গানিক' (Super Organic) এবং 'সুপার ইন্ডিভিসুয়াল' (Super Individual)। সুতরাং কোনও সংস্কৃতিরই পুরোপুরি 'মৃত্যু' ঘটতে পারে—একথা ঠিক নয় সংস্কৃতি পরিবর্তিত হতে পারে।"[১০] সুতরাং 'মৃতপ্রায়' অবস্থা বলতে যে-কোনো ক্ষীয়মান সংস্কৃতির সুপ্তস্তর অর্থাৎ 'Latent Phase'-কে বোঝায়। কাঁদনাগীতের যে লুপ্তপ্রায় দশা তা আসলে সংস্কৃতির অবলীন স্তরে আচ্ছন্ন একটি রূপ। সে পুনরুজ্জীবনের আশা রাখে।

উৎসের সন্ধানে

১. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৭৭
২. তদেব : পৃ. ৭৭
৩. তদেব
৪. দেবশ্রী পালিত, প্রান্তবঙ্গের আন্তপ্রবেশী লোকসংস্কৃতি (গবেষণাপত্র), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 'শোধগঙ্গা' আন্তর্জালিক উৎস থেকে সংগৃহীত, ২০১৪, পৃ. ৮২
৫. দেবশ্রী পালিত : পূর্বোক্ত গবেষণাপত্র, পৃ. ৮৪-৮৫
৬. তদেব : পৃ. ৮৩
৭. বেবী সাউ : 'কাঁদনাগীত : সংগ্রহ ও ইতিবৃত্ত', সৃষ্টিসুখ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৮, পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রে মুদ্রিত।
৮. সুব্রত মুখোপাধ্যায় : 'প্রত্যন্ত বাংলার বিস্মৃতপ্রায় কাঁদনাগীত (প্রবন্ধ), লোকশ্রুতি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, জুন ২০০৪, পৃ. ২০১-২০৫
৯. ফটিকচাঁদ ঘোষ : 'কড়চা, পূর্ব মেদিনীপুর', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ জুন, ২০১৮, পৃ. ক ৪
১০. দেবশ্রী পালিত : পূর্বোক্ত গবেষণাপত্র, পৃ. ৮১